أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 99 - ২) www.motaher21.net

الْحَمْدُ لِلَّهِ

"সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য ।"

" All the praises and thanks be to Allah."

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহরই জন্য।

.....

‘বিসমিল্লাহ’ কি সূরাহ্ ফাতিহার প্রথম আয়াত?

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

অতীব মেহেরবান পরম করুণাময় মহান আল্লাহর নামে আরম্ভ করেছি।

সকল সাহাবী (রাঃ) মহান আল্লাহর কিতাব কুর’আন মাজীদকে বিসমিল্লাহ দ্বারাই আরম্ভ করেছেন। ‘আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, সূরাহ্ ‘নামল’ এর এটি একটি আয়াত। তবে এটি প্রত্যেক সূরার একটি আয়াতের অংশ বিশেষ কি-না, কিংবা এটি কি শুধুমাত্র সূরাহ্ ফাতিহারই আয়াত, অন্য সূরার নয়, কিংবা এক সূরাহেক অন্য সূরাহ্ হতে পৃথক করার জন্যই কি একে লেখা হয়েছে এবং এটি আদৌ আয়ত নয়, এ সব বিষয়ে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ‘আলিমগণের মধ্যে অনেক মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়, অন্য স্থানে এর বিস্তারিত বিবরণও আছে।

সুনানে আবি দাউদে সহীহ সূত্রে ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে একটি সূরাহকে অন্য সূরাহ হতে পৃথক করার বিষয়টি বুঝতেন না। মুসতাদরাক হাকিম এর মধ্যে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। সা‘ঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ) থেকেও হাদীসটি মুরসাল রূপে বর্ণিত হয়েছে। আর সহীহ ইবনু খুযায়মাহেত উম্মু সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘বিসমিল্লাহ’ কে সূরাহ ফাতিহার পূর্বে সালাতে পড়েছেন এবং তাকে একটি পৃথক আয়াতরূপে গণ্য করেছেন। কিন্তু এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী ‘উমার ইবনু হারূন বালখী উসূলে হাদীসের পরিভাষায় দুর্বল। এর অনুসরণে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতেও একটা হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর অনুরূপভাবে ‘আলী, ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ থেকেও বর্ণিত আছে।

‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ), ইবনু ‘উমার, আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) ‘আলী (রাঃ), তাবি‘ঈদের মধ্য থেকে ‘আতা (রহঃ), তাউস (রহঃ), সা‘ঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ), মাকহুল (রহঃ) এবং যুহরী (রহঃ)-এর এটাই নীতি বা অভিমত যে, ‘বিসমিল্লাহ’ সূরাহ্ বারাআত’ ছাড়া আল কুর’আনের প্রত্যেক সূরারই একটা পৃথক আয়াত। তাছাড়া ‘আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইমাম শাফি‘ঈ, আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ)-এর অন্য এক বর্ণনায়ও এমন মত পোষণ করেছেন।

ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর একটি কাওল এবং ইসহাক ইবনু রাহ্ওয়াইহ্ (রহঃ) ও আবূ ‘উবাইদ কাসিম ইবনু সালাম (রহঃ)-এরও এটাই অভিমত। তবে ইমাম মালিক (রহঃ) এবং ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এবং তাঁদের সহচরগণ বলেন যে, ‘বিসমিল্লাহ’ সূরাহ্ ফাতিহারও আয়াত নয় বা অন্য কোন সূরারও আয়াত নয়।

ইমাম শাফি‘ঈ (রহঃ)-এর একটি উক্তি এমন যে, এটা সূরাহ ফাতিহার একটি আয়াত, তবে অন্য কোন সূরাহ এর আয়াত নয়। তাঁর অন্য একটি উক্তি এই যে, এটা প্রত্যেক সূরাহ এর প্রথম আয়াতের অংশ বিশেষ। কিন্তু হাদীসের পরিভাষায় এ দুই উক্তিই হচ্ছে গারীব। দাউদ (রহঃ) বলেনঃ এটা প্রত্যেক সূরাহ এর প্রথমে একটি পৃথক আয়াত, যা সূরাহ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। আর আবূ বাকর রাযী, আবূ হাসান কুরখী (রহঃ)-এরও মাযহাব এটাই। আবূ হাসান কুরখী (রহঃ) ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর একজন বড় মর্যাদাসম্পন্ন সহচর। এ হলো ‘বিসমিল্লাহ’ সূরাহ ফাতিহার আয়াত হওয়া না হওয়ার আলোচনা।

‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ উচ্চস্বরে পাঠ করা প্রসঙ্গ

‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ উচ্চস্বরে পাঠ করতে হবে নাকি নিম্নস্বরে এ নিয়েও মতভেদ রয়েছে। যারা একে সূরাহ্ ফাতিহার পৃথক একটি আয়াত মনে করেন না তারা একে নিম্ন স্বরে পড়ার পক্ষপাতি। এখন অবশিষ্ট রইলেন শুধু ঐ সব লোক যারা বলেন যেমন এটি প্রত্যেক সূরার প্রথম আয়াত। তাদের মধ্যেও

আবার মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ)-এর অভিমত এই যে, সূরাহ্ ফাতিহা ও অন্যান্য প্রত্যেক সূরার পূর্বে একে উচ্চস্বরে পড়তে হবে। সাহাবা (রাঃ), তাবি'ঈন (রহঃ) এবং মুসলিমদের পূর্ববর্তী যুগের ইমামগণের এটাই মাযহাব। সাহাবীগণের (রাঃ) মধ্যে একে উচ্চস্বরে পড়ার পক্ষপাতি হলেন আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) ইবনু 'উমার (রাঃ), ইবনু 'আব্বাস (রাঃ), মু'আবিয়াহ (রাঃ), 'উমার (রাঃ), আবূ বাকর (রাঃ) এবং 'উসমান (রাঃ)। আবূ বাকর (রাঃ) এবং 'উসমান (রাঃ) থেকেও গারীব বা দুর্বল সনদে ইমাম খতীব (রহঃ) এটা নকল করেছেন। বায়হাকী (রহঃ) ও ইবনু 'আবদুল র্বা (রহঃ) 'উমার (রাঃ) ও 'আলী (রাঃ) থেকেও এটি বর্ণনা করেছেন। তাবি'ঈগণের মধ্যে সা'ঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ), ইকরামাহ (রহঃ), আবূ কালাবাহ্ (রহঃ), যুহরী (রহঃ), 'আলী ইবনু হাসান (রহঃ), তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ (রহঃ), সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রহঃ), 'আতা (রহঃ), তাউস (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সালিম (রহঃ), মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব কারাযী (রহঃ), আবূ বাকর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আমর (রহঃ) ইবনু হাযাম, আবূ ওয়ায়িল (রহঃ), ইবনু সীরিন (রহঃ), তাঁর ছেলে মুনকাদির (রহঃ), 'আলী ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রহঃ) তাঁর ছেলে, মুহাম্মাদ, ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর গোলাম নাফি', যায়দ ইবনু আসলাম (রহঃ), 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রহঃ), আযরাক ইবনু কায়িস (রহঃ), হাবীব ইবনু আবী সাবিত (রহঃ), আবূ শা'সা (রহঃ), মাকহুল (রহঃ), 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল ইবনু মাকরান (রহঃ), এবং বায়হাকীর বর্ণনায় 'আবদুল্লাহ ইবনু সাফওয়ান (রহঃ), মুহাম্মাদ ইবনু হানফিয়্যাহ (রহঃ) এবং 'আবদুল বারের বর্ণনায় 'আমর ইবনু দীনার (রহঃ)। তাঁরা সবাই সালাতের যেখানে কিরা'আত উচ্চস্বরে পড়া হয়, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমকেও উচ্চ শব্দে পড়তেন।

এর একটি প্রধান দালীল এই যে, এটি যখন সূরাহ্ ফাতিহারই একটি আয়াত তখন পূর্ণ সূরার ন্যায় একে উচ্চস্বরে পড়তে হবে। তাছাড়া সুনান নাসাঈ, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্, সহীহ ইবনু হিব্বান, মুসতাদরাক হাকিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) সালাত আদায় করলেন এবং কিরা'আত পড়লেন এবং কিরা'আতে উচ্চ শব্দে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়লেন এবং সালাত শেষে বললেনঃ 'তোমাদের সবার চেয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সালাতের সাথে আমার সালাতেরই সামঞ্জস্য বেশি।' (সুনান নাসাঈ ২/৯০৪, ইবনু খুযায়মাহ ১/৪৯৯, ইবনু হিব্বান ৩/১৪৫ পৃষ্ঠা, মুসতাদরাক হাকিম ১/২৩২, দারাকুতনী ১/৩০৫ এবং সুনান বায়হাকী ২/৪৬। হাদীস সহীহ)

সুনান আবূ দাউদ ও জামি'উত তিরমিযীর মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'বিসমিল্লাহির রহমানরি রাহীম' দ্বারা সালাত শুরু করতেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন হাদীসটি সঠিক নয়। (জামি'উত তিরমিযী ২/ ২৪৫, শারহুস সুন্নাহ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৭, হাদীস ৫৮৫, তুহফাতুল আশরাফ ৫/২৬৫, নাসবুর রায় ১/৩৪৬, তালখীসুল হুবাইর ১/২৩৪। হাদীস যঈফ)

মুসতাদরাকে হাকিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'বিসমিল্লাহির রহমানরি রাহীম' উঁচস্বরে পড়তেন। ইমাম হাকিম (রহঃ) এ হাদীসকে সঠিক বলেছেন। (মুসতাদরাক হাকিম ১/২০৮, নাসবুর রায় ১/৪৬৭, ইমাম হাকিম (রহঃ) হাদীসটিকে সহীহ বললেও ইমাম যায়লা'ঈ যঈফ বলেছেন)

সহীহুল বুখারীতে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাকে তথা আনাস (রাঃ)-কে 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কিরা'আত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় যে তা কিরূপ ছিলো? উত্তরে তিনি বললেনঃ 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক মাদের শব্দকে লম্বা করে পড়তেন।' তিনি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পাঠ করে শুনালেন এবং বললেন بِسْمِ اللّٰهِ-এর ওপর মদ্ বা লম্বা করেছেন। الرَّحْمٰنِ-এর ওপর মদ্ করেছেন ও الرَّحِيْمِ-এর ওপর মদ্ করেছেন অর্থাৎ লম্বা করে টেনে পড়েছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৭০৯। সহীহুল বুখারী ১/৫০৪৬)

মুসনাদ আহমাদ, সুনান আবূ দাঊদ, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ এবং মুসতাদরাক হাকিমে উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক আয়াত শেষে থামতেন এবং তাঁর কিরা'আত পৃথক হতো। যেমন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়ে থামতেন, তারপর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ পড়তেন, পুনরায় থেমে الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়তেন। দারাকুতনী (রহঃ) এ হাদীসটিকে সঠিক বলেছেন। (মুসনাদ আহমাদ ৬/৩০২, সুনান আবূ দাঊদ ৪/৪০০১, জামি'উত তিরমিযী ৫/২৯২৩, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ১/২৪৮, হাকিম ২/২৩১, দারাকুতনী ১/৩১৩, হাদীস সহীহ)

ইমাম শাফি'ঈ (রহঃ) ও ইমাম হাকিম (রহঃ) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মু'আবিয়াহ (রাঃ) মাদীনায় সালাত পড়ালেন এবং 'বিসমিল্লাহ' পড়লেন না। সে সময় যেসব মুহাজির সাহাবী (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন তাঁরা এতে আপত্তি জানালেন। সুতরাং তিনি পুনরায় যখন সালাত আদায় করানোর জন্য দাঁড়ালেন তখন উচ্চস্বরে 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করলেন। (মুসতাদরাক হাকিম ১/২৩৩, মুসনাদ আশ শাফি'ঈ ১/৮০। ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেন, ইমাম মুসলিম -এর শর্তানুসারে হাদীসটি সহীহ। অত্র হাদীসের একজন রাবী আব্দুল মাজীদ ইবনু আব্দুল আযীয কে হাফিয ইবনু হাজার আল 'আসকালানী 'মাতরূক' তথা বর্জনীয় বলে আখ্যা দিয়েছেন) প্রায় নিশ্চিতরূপেই উল্লিখিত সংখ্যক হাদীস এ মাযহাবের দালীলের জন্য যথেষ্ট। এখন বাকী থাকলো তাঁদের বিপক্ষের হাদীস বর্ণনা ও সনদের দুর্বলতা ইত্যাদি। এগুলোর জন্য অন্য জায়গা রয়েছে।

দ্বিতীয় অভিমত এই যে, 'বিসমিল্লাহ' জোরে পড়তে হবে না। খালীফা চতুষ্টয়, 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল, তাবি'ঈন ও পরবর্তী যুগের দলসমূহ থেকে এটা সাব্যস্ত আছে। আবূ হানীফা (রহঃ), সাওরী (রহঃ) এবং আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহঃ)-এর এটাই অভিমত।

ইমাম মালিকের (রহঃ) অভিমত এই যে, 'বিসমিল্লাহ' পড়তেই হবে না, জোরেও নয়, আস্তেও নয়। তাঁর প্রথম দালীল তো সহীহ মুসলিমের 'আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসটি যাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাতকে তাকবীর ও কিরা'আত اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ দ্বারা শুরু করতেন। (সহীহ মুসলিম ১/ ২৪০, ৩৫৭, ৩৫৮, ইবনু মাজাহ ১/৮১২, মুসনাদ আহমাদ ৬/৩১, ১৯৪, সুনান আবূ দাউদ ৭৮৩, সুনান বায়হাকী ২০৯৩, ২২৪৪, ২৭৮৫, সুনান দারিমী ১২৩৬, হাদীস সহীহ) সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আছে যে, আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ 'আমি মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আবূ বাকর (রাঃ), 'উমার (রাঃ), এবং 'উসমান (রাঃ)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি। তাঁরা সবাই اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ দ্বারা সালাত আরম্ভ করতেন। সহীহ মুসলিমে আছে যে, বিসমিল্লাহ পাঠ করতেন না।

কিরা'আতের প্রথমেও না, শেষেও না। (ফাতহুল বারী ২/২৬৫, সহীহুল বুখারী ২/৭৪৩, সহীহ মুসলিম ১/৫২/২৯৯) সুনানে 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল (রাঃ) থেকেও এরূপই বর্ণিত আছে। (জামি'উত তিরমিযী ২৪৪) এ হলো ঐসব ইমামের 'বিসমিল্লাহ' আস্তে পড়ার দালীল। এ প্রসঙ্গে এটাও জ্ঞাতব্য যে, এটি কোন বড় রকমের মতভেদ নয়। প্রত্যেক দলই এ বিষয়ে একমত যে, 'বিসমিল্লাহ' উঁচস্বরে পড়ুক আর নীরবে পড়ুক সালাত শুদ্ধ হবে।

'বিসমিল্লাহর' গুরুত্ব ও ফাযীলত

ইমাম, জ্ঞানী, পণ্ডিত, 'আবিদ আবূ মুহাম্মাদ 'আব্দুর রহমান ইবনু আবী হাতিম (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রাঃ) 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বললেন, তা হলো মহান আল্লাহর নাম সমূহের একটি নাম। মহান আল্লাহর বড় নাম এবং বিসমিল্লাহর মধ্যে এতদুর নৈকট্য রয়েছে, যেমন নৈকট্য রয়েছে চক্ষুর কালো অংশ ও সাদা অংশের মাঝে। (হাদীস খুবই য'ঈফ, মুসতাদরাক হাকিম ১/৫৫২. সুনান বায়হাকী শু'আবুল ইমান ২/৪৩৭)

আবূ বাকর ইবনু মারদুওয়াই (রহঃ) ও স্বীয় তাফসীরে এরূপ বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তিনি দু'টি সূত্র বর্ণনা করেছেন। তার দ্বিতীয় বর্ণনাটি হলো, আবূ সা'ঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'ঈসা (আঃ)-এর মা মারইয়াম (আঃ) যখন তাকে মক্তবে নিয়ে গিয়ে শিক্ষকের সামনে বসালেন, তখন তাকে বললেন, 'বিসমিল্লাহ' লেখুন। 'ঈসা (আঃ) বললেন, 'বিসমিল্লাহ' কি? শিক্ষক উত্তরে বললেন, আমি জানি না। তিনি বললেন, ب এর ভাবার্থ হলো بهاء الله অর্থাৎ আল্লাহর উঁচতা, س এর ভাবার্থ হলো سناءه অর্থাৎ আল্লাহর আলোক, م এর তাৎপর্য হলো مملكته বা আল্লাহর রাজত্ব। الله বলে উপাস্যদের উপাস্যদেরকে। رحمن বলে দুনিয়া ও আখিরাতের করুণাময়কে। আর আখিরাতে যিনি দয়া প্রদর্শন করবেন তাকে رحيم বলা হয়। (হাদীসটি মাওযু' ইবনুল জাওযী স্বীয় মাওযু'আতের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। অত্র হাদীসের সনদে ইসমা'ঈল ইবনু ইয়াহ্ইয়াহ্ নামে একজন মিথ্যুক রাবী আছে) ইবনু জারীর (রহঃ) ও স্বীয় তাফসীরে এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাফসীর তাবারী, প্রথম খণ্ড, হাঃ ১৪৭, হাদীস যঈফ) কিন্তু সনদের দিক থেকে তা খুবই দুর্বল। হতে পারে যে, এটি কোন সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে কিংবা এমনও হতে পারে যে, বানী ইসরাইলের বর্ণনা সমূহের একটি বর্ণনা। এটা মারফূ' হাদীস হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। অবশ্য মহান আল্লাহই এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

ইবনু মারদুওয়াই এর তাফসীরে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমার ওপর এমন একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যা আমি ও সুলায়মান ইবনু দাউদ (আঃ) ব্যতীত অন্য কারো ওপর অবতীর্ণ হয়নি। আয়াতটি হলো, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'। (হাদীসটি য'ঈফ) জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, যখন 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' অবতীর্ণ হলো, তখন পূর্বদিকে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। বায়ূ মণ্ডলী স্তব্ধ হয়ে যায়। তরঙ্গমালা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে প্রশান্ত হয়ে উঠে। জন্তুগুলো কান লাগিয়ে মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকে। আকাশ থেকে অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হয়ে শায়তানকে বিতাড়ন করে এবং

বিশ্বপ্রভু স্বীয় সম্মান ও মর্যাদার কসম করে বলেন, যে জিনিসের ওপর আমার এ নাম নেয়া হবে তাতে অবশ্যই বরকত হবে। (হাদীসটি সহীহ)

'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, জাহান্নামের ঊনিশটি দরজার হাত হতে যে বাঁচতে চায়, সে যেন 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' পড়ে। কেননা এতেও ঊনিশ অক্ষর বিদ্যমান। আর এর প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে তার জন্য মহান আল্লাহ একজন রক্ষক নির্ধারণ করবেন। (তাফসীরে কুরতুবী, ১/১০৭, সহীহুল বুখারী ২/৭৯৯) কুরতুবীর সমর্থনে ইবনু 'আতিয়্যাহ এটা বর্ণনা করেছেন এবং এর প্রষ্ঠপোষকতায় তিনি আরও একটি হাদীস এনেছেন। তাতে রয়েছেঃ فقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها অর্থাৎ আমি স্বচক্ষে ত্রিশের বেশি ফিরিশতা দেখেছি, যারা এটা নিয়ে তাড়াহুড়া করছিলেন। এটা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই সময় বলেছিলেন যখন একজন লোক رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ পাঠ করেছিলেন। এর মধ্যে ত্রিশের বেশি অক্ষর রয়েছে। তৎসংখ্যক ফিরিশতাও অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এ রকমই বিসমিল্লাহর মধ্যে ঊনিশটি অক্ষর আছে এবং তথায় ফিরিশতার সংখ্যাও হবে ঊনিশ। (হাদীস সহীহ, মুসনাদ আহমাদ ৫/৫৯, ৭১, মুসতাদরাক হাকিম ৪/২২৯)

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাওয়ারীর ওপর তাঁর পিছনে যে সাহাবী (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন তাঁর বর্ণনাটি এইঃ 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উষ্ট্রীটির কিছু পদস্খলন ঘটলে আমি বললাম যে, শায়তানের সর্বনাশ হোক। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

তোমরা তা থেকে অভিশপ্ত শায়তান বলো না, কারণ এতে সে গর্বে বড় হয়ে যায়, এমনকি একটি বড় ঘর হয়ে যায়। বরং বিসমিল্লাহ বলো, কারণ এতে শায়তান ছোট হতে হতে মাছির মতো হয়ে যায়। (আল 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইল ৫৫৫, সহীহুল জামি' ৭৪০১, মুসনাদ আহমাদ ৫/৫৯) এটাই হলো একমাত্র বিসমিল্লাহর বরকতের প্রভাব।' আর এ জন্যই প্রত্যেক কাজের শুরুতে এবং বক্তব্যের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা মুস্তাহাব। অতএব খুতবার শুরুতেও 'বিসমিল্লাহ' বলা মুস্তাহাব। যেমন হাদীসে এসেছে যে কাজ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' ব্যতীত শুরু করা হয় তা লেজ কাটা, তথা বরকতশুন্য। (হাদীস য'ঈফ)

প্রতিটি কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার বিধান

ওপরোল্লিখিত বরকতের ভিত্তিতেই প্রত্যেক কাজ ও কথার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। খুতবার শুরুতেও বিসমিল্লাহ বলা উচিত। হাদীসে আছে যে, বিসমিল্লাহ দ্বারা যে কাজ আরম্ভ করা না হয় তা কল্যাণহীন ও বরকতশূন্য থাকে। বিভিন্ন হাদীসের ভিত্তিতে টয়লেট বা বাথরুমে প্রবেশ কালেও বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। অনুরূপভাবে ওযূর শুরুতেও বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। কেননা মুসনাদ আহমাদ এবং সুনানের কিতাবে রয়েছে আবূ হুরায়রাহ (রাঃ), সা'ঈদ ইবনু যায়দ (রহঃ) এবং আবূ সা'ঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ওযূর সময় বিসমিল্লাহ বলে না, তার ওযূ হয় না।' (সহীহ আবূ দাউদ ৯১, সুনান আবূ দাউদ, ১০২, সহীহ ইবনু মাজাহ ৩১৮, সুনান ইবনু মাজাহ ৩৯৭, সুনান তিরমিযী ২৫, সুনান দারাকুতনী ৩, সুনান দারিমী ৬৯১, মুসনাদ আহমাদ ১১৩৭০, ১১৩৭১, মুসতাদরাক হাকিম ৫১৮, ৫১৯, ৫২০, হাদীস সহীহ) এ হাদীসটি হাসান বা উত্তম। কোন কোন 'আলিম তো ওযূর সময় বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব বলে থাকেন। আবার কেউ সর্বকাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব বলেছেন। প্রাণী যবেহ করার সময়েও বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব। ইমাম শাফি'ঈ সহ একটি দলের মত এটাই। কেউ কেউ যিকিরের সময় এবং কেউ কেউ সাধারণভাবে একে ওয়াজিব বলে থাকেন। এর বিশদ বর্ণনা ইনশা'আল্লাহ আবার অতি সত্বরই আসবে।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে এই আয়াতটির ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর মধ্যে একটি হলো, আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তুমি যখন স্ত্রী মিলনের ইচ্ছা করবে, তখন বিসমিল্লাহ বলে নিয়ো। কেননা এই মিলনের পর তোমাকে যদি সন্তান দেয়া হয়, তাহলে তার নিজের ও তার সমস্ত ঔরসজাত সন্তানের নিঃশ্বাসের সংখ্যার সমান পুণ্য তোমার 'আমলনামায় লেখা হবে। অবশ্য এর কোন মূলভিত্তি নেই। আমি নির্ভরযোগ্য কোন কিতাবে এবং এমনকি অন্য কোন কিতাবেও এটা পাইনি। খাওয়ার সময়ে বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব।

সহীহ মুসলিমে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'উমার ইবনু আবী সালামাহ (রাঃ)-কে অর্থাৎ যিনি তাঁর সহধর্মিনী উম্মু সালামাহ্ (রাঃ)-এর পূর্ব স্বামীর পুত্র ছিলেন তিনি বলেনঃ

قُلْ بِاسْمِ اللهِ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

'বিসমিল্লাহ বলো, ডান হাতে খাও এবং তোমার সামনের দিক থেকে খেতে থাকো।' (সহীহ মুসলিম ৩/১০৮, ১৫৯৯, ১৬০০, সুনান আবূ দাউদ ৩/৩৭৭৭, জামি'উত তিরমিযী ৪/১৮৫৭, সুনান ইবনু মাজাহ ১/৩২৬৭, মুসনাদ আহমাদ ৪/ ২৬, ২৭, ৪৫, ৪৬, ৫০, হাদীস সহীহ) কোন কোন 'আলিম এ সময়েও 'বিসমিল্লাহ' বলা ওয়াজিব বলে থাকেন। স্ত্রীর সাথে মিলনের সময়েও 'বিসমিল্লাহ' বলা মুস্তাহাব।

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ স্বীয় স্ত্রীর সাথে মিলনের ইচ্ছা করলে সে যেন এটা পাঠ করেঃ بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا.

'মহান আল্লাহর নামের সাথে আরম্ভ করছি। হে মহান আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এবং যা আমাদেরকে দান করবেন তাকেও শায়তানের কবল থেকে রক্ষা করুন।' তিনি আরো বলেন যে, এই মিলনের ফলে যদি সে গর্ভধারণ করে তাহলে শায়তান সেই সন্তানের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (ফাতহুল বারী ৯/১৩৬,

সহীহুল বুখারী, ৬/৩২৮৩, সহীহ মুসলিম ৩/১১৬, ১০৫৮, সুনান আবূ দাউদ ২/২১৬১, সুনান তিরমিযী ৩/১০৯২, সুনান ইবনু মাজাহ ১/১৯১৯, মুসনাদ আহমাদ১/২৮৬, হাদীস সহীহ) এখান থেকে স্পষ্ট হলো যে, বিসমিল্লাহ এর ب এর সম্পর্ক কার সাথে রয়েছে।

ব্যাকরণগত শব্দ বিন্যাস

বিসমিল্লাহ এর ب এর সম্পর্ক اسم এর সাথে না فعل এর সাথে তা নির্ণয়ে ব্যাকরণবিদগণের পক্ষ থেকে দু'টি মত রয়েছে। তবে মত দু'টি একটি অন্যটির কাছাকাছি। প্রত্যেকে স্বীয় মতের পক্ষে কুর'আন থেকেই যুক্তি দেখিয়েছেন।

সুতরাং যারা اسم কে উহ্য মানেন, তাদের মতে উহ্য 'ইবারত হবে ابتدائي باسم الله অর্থাৎ আমার শুরু মহান আল্লাহর নামের সাথে। তাদের দালীল মহান আল্লাহর বাণীঃ

﴿ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾

'এতে আরোহণ করো, মহান আল্লাহর নামে এর গতি ও এর স্থিতি। আমার প্রতিপালক অবশ্যই বড়ই ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালু।' (১১ নং সূরাহ হুদ, আয়াত-৪১) এ আয়াতে اسم তথা مصدر উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে।

আর যারা فعل কে উহ্য মানেন, তাদের দালীলঃ اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ 'পাঠ করো তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।' (৯৬ নং সূরাহ আল 'আলাক, আয়াত ১) তবে উভয়টি সঠিক। কেননা فعل এর জন্যেও مصدر আবশ্যক। অতএব فعل বা مصدر এর যে কোন একটি উহ্য মানার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রয়েছে। অতএব যে مصدر কে فعل বা ক্রিয়া অনুপাতে নিয়ে আসা হবে। দাঁড়ানো, বসা, খানাপিনা, কুর'আন পাঠ, ওযূ ও সালাত যা-ই হোক কেন এগুলোর শুরুতে বরকত, কল্যাণ, ও সাহায্য প্রার্থনার উদ্দেশ্যে এবং তা যাতে মঞ্জুর হয় সে জন্য মহান আল্লাহর নাম নেয়া ইসলামী শারী'আতের একটি অন্যতম বিধান। মহান আল্লাহই এসব বিষয়ে ভালো জানেন। তাইতো ইবন ও ইবনু আবী হাতিম (রহঃ) নিজ নিজ তাফসীর গ্রন্থে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, নিশ্চয় জিবরাইল (আঃ) সর্বপ্রথম যে বিধানটি মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর অবতীর্ণ করেন তা হলো, 'হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি বলুন, أَسْتَعِيذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ অর্থাৎ আমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানীর নিকট বিতাড়িত শায়তানের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আবার বললো আপনি বলুন, بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ অর্থাৎ পরম করুণাময় অসীম দয়ালু মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি। বর্ণনাকারী ইবনু 'আব্বাস বলেন, জিবরাঈল (আঃ) বললো, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! তুমি বিসমিল্লাহ বলো। উদ্দেশ্য ছিলো যেন উঠা, বসা, পড়া, খাওয়া সব কিছুই আল্লাহর নামে শুরু হয়। (তাফসীর তাবারী, প্রথম খণ্ড, হাদীস ১৩৯, হাদীস য'ঈফ)

اسم শব্দের বিশ্লেষণ

اسم অর্থাৎ নামটাই কি মুসাম্মা তথা নাম যুক্ত না অন্য কিছু। এ ক্ষেত্রে মনিষীগণের মাঝে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মত আছে।

একঃ নামটাই হচ্ছে মুসাম্মা বা নামযুক্ত। আবূ ‘উবাইদা এবং সিবাওয়াইয়ের মত এটাই। বাকিল্লানী ও ইবনু ফরুকও এমতটি পছন্দ করেন। মুহাম্মাদ ইবনু ‘উমার ইবনু খাতীব রাযী স্বীয় তাফসীরের সূচনায় লিখেছেনঃ ‘হাসভিয়্যাহ, (শি‘আ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হিশামীদের মতো মহান আল্লাহর জন্য তাসবীহ সাব্যস্তকারী একটি সম্প্রদায়, তারা বলে ‘তাদের মা‘বূদ হচ্ছে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট একটি আকার সম্পন্ন সত্তা। সেটা রূহানী অথবা দৈহিক হতে পারে। তার জন্য স্থানান্তরিত হওয়া, অবতরণ করা, ওপরে উঠা, স্থির থাকা সবই সাব্যস্ত করে। (আল মিলাল ওয়াল মিনহাল ১/১১২)) কারামিয়্যাহ (তারা আবূ ‘আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু কাররাম এর অনুসারীগণ। তিনি মহান আল্লাহর জন্য সিফাত তথা গুণ সাব্যস্ত করতেন তবে তা শরীর এর মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করেন। আর মহান আল্লাহর জন্য তাশবীহ সাব্যস্ত করেন। (আল মিলাল ওয়াল মিনহাল ১/১১৫)) ও আশ‘আরীগণ (আবুল হাসান ‘আলী ইবনু ইসমা‘ঈল আল আশ‘আরীর অনুসারীগণ। (আল মিলাল ওয়াল মিনহাল ১/৯৭) বলেন যে, اسم হলো نفس مسمى কিন্তু نفس تسمية হতে আলাদা। আর মু‘তাযিলাগণ (তারা বলে যে, কুর’আন মাখলূক, (আল মিলাল ওয়াল মিনহাল ১/৫০, ৫১) বলেন যে, اسم হলো نفس تسمية কিন্তু نفس مسمى হতে পৃথক। আমাদের মতে اسم টি مسمى ও غير مسمى দু’টো থেকেই আলাদা। আমরা বলি যে, যদি اسم এর উদ্দেশ্য لفظ হয় যা শব্দ সমূহের অংশ বা অক্ষরসমূহের সমষ্টি, তাহলে এটা অত্যাবশ্যকীয়ভাবে সাব্যস্ত হয় যে, এটা مسمى হতে পৃথক। আর যদি اسم হতে উদ্দেশ্য হয় ذات مسمى তাহলে এটা হবে একটি স্পষ্টকে স্পষ্ট করার কাজ যা শুধু নিরর্থক ও বাজে কাজেরই নামান্তর। সুতরাং এটা স্পষ্ট কথা যে, বাজে আলোচনায় সময়ের অপচয় একটা নিছক অনর্থক কাজ। অতঃপর اسم ও مسمى কে পৃথকীকরণের ওপর দালীল প্রমাণ আনা হয়েছে যে, কখনো اسم হয় কিন্তু مسمى হয় না। যেমন معدوم বা অস্তিত্বহীন শব্দটি। কখনও আবার একটি مسمى কয়েকটি اسم হয়। যেমন مترادف বা সমার্থবোধক শব্দ। আবার কখনো اسم একটি হয় এবং مسمى হয় কয়েকটি। যেমন مشترك, সুতরাং বোঝা গেলো যে, اسم ও مسمى এক জিনিস নয়। অর্থাৎ নাম এক জিনিস আর মুসাম্মা বা নামধারী অন্য জিনিস। কারণ যদি اسم কেই مسمى ধরা হয়, তবে আগুনের নাম নেয়া মাত্রই তার দাহন ও গরম অনুভূত হওয়া উচিৎ। আর বরফের নাম নিলেই ঠাণ্ডা অনুভূত হওয়া দরকার। অথচ কোন জ্ঞানীই একথা বলেন না। আর বলতেও পারেন না। এর দালীল প্রমাণ এই যে, আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ রয়েছে, وَللهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ‘মহান আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, তোমরা ঐসব নাম দ্বারা আল্লাহকে ডাকতে থাকো।’ (৭ নং সূরাহ আল আ‘রাফ, আয়াত ১৮০) আর হাদীসে আছেঃ إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا ‘আল্লাহ তা‘আলার ৯৯টি নাম আছে।’(সহীহুল বুখারী ২৫৮৫, ৬৯৫৭, সহীহ মুসলিম ৬৯৮৬, সুনান ইবনু মাজাহ ৩৮৬০, ৩৮৬১, সুনান তিরমিযী ৩৫০৬, ৩৫০৮, মুসনাদ আহমাদ, ৭৫০২, ৭৬২৩, হাদীস সহীহ) তাহলে চিন্তার বিষয় যে, নাম কতো বেশি আছে। অথচ مسمى একটিই। আর তিনি হলেন অংশীবিহীন অদ্বিতীয় মহান আল্লাহ। এরকমই اسماء কে এ আয়াতে الله এর দিকে সম্বন্ধ লাগানো হয়েছে। মহান আল্লাহ অন্য এক জায়গায় বলেছেনঃ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ‘কাজেই তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের গৌরব ও মহিমা ঘোষণা করো।’ (৬৯ সূরাহ আল হাক্কাহ, আয়াত ৫২) ইত্যাদি। اضافت ও

এটাই চায় যে, اسم ও مسمى অর্থাৎ নাম ও নামধারী ভিন্ন জিনিস। কারণ إضافة দ্বারা সম্পূর্ণ অন্য এক বিরোধী বস্তুকে বুঝায়। এরকমই মহান আল্লাহর উপরোক্ত নির্দেশঃ فادعوه بها অর্থাৎ মহান আল্লাহকে তাঁর নামসমূহ দ্বারাই ডাকো। এটাও এ বিষয়ের দালীল প্রমাণ যে, নাম এক জিনিস আর নামধারী ভিন্ন জিনিস। অতএব যারা اسم ও مسمى কে এক বলেন তাদের দালীল এই যে, মহান আল্লাহ বলেনঃ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ 'ক্ষমতা, দয়ামায়া ও সম্মানের অধিকারী তোমার প্রতিপালকের নাম বড়ই কল্যাণময়।' (৫৫ নং সূরাহ আর রাহমান, আয়াত-৭৮) এখানে নামকে কল্যাণময় ও মর্যাদাসম্পন্ন বলা হয়েছে, অথচ স্বয়ং আল্লাহই কল্যাণময়। এর সহজ উত্তর এই যে, সেই পবিত্র প্রভুর কারণেই তাঁর নামও শ্রেষ্ঠত্বপূর্ণ হয়েছে। তাদের দ্বিতীয় দালীল এই যে, যখন কেউ বলে 'যায়নাবের ওপর তালাক' তখন শুধু সেই ব্যক্তির ঐ স্ত্রীর ওপরই তালাক হয়ে থাকে যার নাম যায়নাব। যদি নাম ও নামধারীর মধ্যে পার্থক্য থাকতো তবে শুধু নামের ওপরই তালাক পড়তো, নামধারীর ওপর কি করে পড়তো? এর উত্তর এই যে, এ কথার ভাবার্থ এই রূপ যে, যার নাম যায়নাব তার ওপর তালাক। تسمية এর اسم হতে ভিন্ন হওয়া এই দালীল এর ওপর ভিত্তি করে যে, تسمية বলা হয় কারো নাম নির্ধারণ করাকে। আর এটা সুস্পষ্ট কথা যে, এটা এক জিনিস এবং নামধারী অন্য জিনিস। ইমাম রাযী (রহঃ)-এরও কথা এটাই। এই সবকিছু باسم এর সম্পর্কে আলোচনা ছিলো। এখন الله শব্দ সম্পর্কে আলোচনা শুরু হচ্ছে।

'আল্লাহ' শব্দের অর্থ

اَللهُ বরকত বিশিষ্ট ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মহান প্রভুর একটি বিশিষ্ট নাম। বলা হয় যে, এটাই إِسْمِ اَعْظَم কেননা সমুদয় উত্তম গুণের সাথে এটাই গুণান্বিত হয়ে থাকে। যেমন পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

﴿هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ۲۲ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ۲۳ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ﴾

তিনিই মহান আল্লাহ, তিনি ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই মহান আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত; যারা তাঁর শরীক স্থির করে মহান আল্লাহ তা থেকে পবিত্র ও মহান। তিনিই মহান আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৫৯ নং সূরাহ্ হাশর, আয়াত নং ২২-২৪)

এ আয়াতসমূহে 'আল্লাহ' ব্যতীত অন্যান্য সবগুলোই গুণবাচক নাম এবং এগুলো 'আল্লাহ' শব্দেরই বিশেষণ। সুতরাং মূল ও প্রকৃত নাম 'আল্লাহ'। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেনঃ

﴿وَ لِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا﴾

আর মহান আল্লাহর জন্য সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, সুতরাং তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাকবে। (৭ নং সূরাহ্ আ'রাফ, আয়াত নং ১৮০) অপর আয়াতে মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ﴾

'বলো! তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহ্বান করো অথবা 'রাহমান' নামে আহ্বান করো, তোমরা যে নামেই আহ্বান করো না কেন, সব সুন্দর নামই তো তাঁর!' (১৭ নং সূরাহ্ ইসরাহ, আয়াত নং ১১০)

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

إِنَّ لِلهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

'মহান আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মহান আল্লাহর নিরানব্বই অর্থাৎ এক কম একশ'টি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি তা মনে রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহীহুল বুখারী হাঃ ২/২৭৩৬, ৬৪১০, ৭৩৯২, সহীহ মুসলিম ৪৮/২ হাঃ ২৬৭৭, মুসনাদ আহমাদ হাঃ ৭৫০৫, আ.প্র. হাঃ ২৫৩৪, ই.ফা. হাঃ ২৫৪৬। মাকতাবে শামিলাহ: সহীহুল বুখারী ২৫৮৫, ৬৯৫৭, সহীহ মুসলিম ৬৯৮৬, সুনান ইবনু মাজাহ ৩৮৬০, ৩৮৬১, সুনান তিরমিযী ৩৫০৬, ৩৫০৮, মুসনাদ আহমাদ, ৭৫০২, ৭৬২৩, হাদীস সহীহ) 'জামি'উত তিরমিযী ও সুনান ইবনু মাজায় নামগুলো এসেছে। (হাদীসটি সহীহ। জামি' তিরমিযী ৯/৪৮০, সুনান ইবনু মাজাহ ২/২১৬৯) এ দু'হাদীস গ্রন্থের বর্ণনায় শব্দের কিছু পার্থক্য আছে এবং সংখ্যায় কিছু কম-বেশি রয়েছে।

'আর রাহমানির রাহীম'-এর অর্থ

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ শব্দ দু'টিকে رَحْمَتْ থেকে নেয়া হয়েছে। অর্থের দিক দিয়ে দু'টির মধ্যেই 'মুবালাগাহ' বা আধিক্য রয়েছে, তবে 'রাহীমের' চেয়ে 'রাহমানের' মধ্যে আধিক্য বেশি আছে। 'আল্লামাহ্ ইবনু জারীর (রহঃ)-এর কথা অনুযায়ী জানা যায় যে, এতে প্রায় সবাই একমত। পূর্ববর্তী যুগের সালফি সালিহীন 'ঈসা (আঃ)-এর সূত্রে বলেন যা ইতোপূবেই উল্লিখিত হয়েছে যে, রাহমানের অর্থ হলো দুনিয়া ও আখিরাতে দয়া প্রদর্শনকারী এবং রাহীমের অর্থ শুধু আখিরাতে রহমকারী।

কেউ কেউ বলেন যে, رَحْمَن শব্দটি مُشْتَق নয়। কারণ যদি তা এ রকমই হতো তাহলে مَرْحُوْم-এর সাথে মিলে যেতো। অথচ কুর'আনুল কারীমের মধ্যে রয়েছেঃ ﴿ وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴾

আর তিনি মু'মিনদের প্রতি পরম দয়ালু। (৩৩ নং সূরাহ্ আহযাব, আয়াত নং ৪৩)

ইবনুল 'আরবী মুবাররাদের সূত্রে বলেছেন যে, رحمن হচ্ছে 'ইবরানী নাম, 'আরবী নয়। আর আবূ ইসহাক আয-যুজাজ معاني القرآن নামক গ্রন্থে আহমাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া (রহঃ)-এর উক্তি উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি বলেছেন الرحيم 'আরবী, আর الرحمن 'ইবরানী নাম। আর এই জন্য উভয়টিকে একত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু আবূ ইসহাক বলেন, এ কথাটি غير مرغوب তথা অপছন্দনীয়।

ইমাম কুরতবী (রহঃ) এ শব্দটিকে مشتق বলেছেন। তিনি দালীল হিসেবে জামি' তিরমিযী বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং তা সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর তা হলো 'আবদুর রহমান ইবনু 'আউফ (রাঃ) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন, মহান আল্লাহ বলেনঃ

أَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنَ اسْمِى فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ

আমিই আর-রাহমান, আমি রাহম সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম থেকেই রাহীম নামের সৃষ্টি। অতএব, যে এর হিফাযত করে, আমি তার সাথে সম্পর্ক অটুট রাখি এবং যে ছিন্ন করে আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। (জামি' তিরমিযী ৪/১৯০৭, সুনান আবূ দাউদ ২/১৬৯৪, মুসনাদ আহমাদ ২/৪৯৮, মুসতাদরাক হাকিম ৪/১৫৭, সুনান বায়হাকী ১২৯৯৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৪৪৩, হাদীস সহীহ) তিনি বলেন, এটা হলো الرحمن শব্দটি مشتق হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ। অতএব প্রকাশ্য হাদীসের বিরোধিতা ও অস্বীকার করার কোন উপায় বা অবকাশ নেই। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা, মূর্খতা ও বোকামীর কারণেই আরবগণ الرحمن নামকে অস্বীকার করে।

কুরতবী (রহঃ) বলেন, বলা হয়ে থাকে যে, এ শব্দ দু'টি ندمان ও نديم এর ন্যায় একই অর্থবোধক। আবূ 'উবাইদ এমন কথা বলেছেন। আবার কেউ কেউ এটাও বলেছেন যে, فَعْلان শব্দটি فعيل এর মতো নয়। কেননা فعلان শব্দটি অত্যাবশ্যকীয়ভাবে ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার আধিক্যতার প্রতি প্রমাণ করে। যেমন কারো উক্তি- رجل غضبان তথা লোকটি খুবই রাগান্বিত। এটা তখনই বলা হয়, যখন সে পূর্ণ রাগান্বিত হয়। আর فعيل এর ওযনটি কখনো কখনো কর্তা ও কর্ম উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়, যাতে আধিক্যতার প্রতি প্রমাণ থাকে না।

আবূ 'আলী ফারসী (রহঃ) বলেন যে, الرحمن মহান আল্লাহর সাথে নির্ধারিত রহমতের সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্তকারী একটি ব্যাপক অর্থবোধক নাম। আর الرحيم শুধু মু'মিন তথা বিশ্বাসীদের সাথে নির্ধারিত নাম।

যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ‘আর তিনি মু’মিনদের প্রতি পরম দয়ালু।’ (৩৩ নং সূরাহ্ আহযাব, আয়াত নং ৪৩)

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, هُمَا اِسْمَانِ رَقِيْقَانِ أَحَدُهُمَا أَرَقُّ مِنَ الْآخَرِ ‘এই দু’টি নামই করুণা ও দয়া বিশিষ্ট। একের মধ্যে অন্যের তুলনায় দয়া ও করুণা বেশি আছে।’ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-এর এ বর্ণনায় أَرَقُّ শব্দের জটিলতা নিরসনে খাত্তাবী ও অন্যান্যরা বলেছেন হয়তো أرق দ্বারা أرفق উদ্দেশ্য। যেমন হাদীসে রয়েছেঃ

إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ.

নিশ্চয় মহান আল্লাহ দয়ালু, তিনি দয়া করাকে পছন্দ করেন। নিতি নম্রতা ও দয়ার কারণে এমন নি‘য়ামত দান করেন যা কঠোরতার কারণে দেন না। (সহীহ মুসলিম, হাদীস- ৬৭৬৬, বাকী অংশ হলো, وَمَا لَا يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ। মুসনাদ আহমাদ ১/১১২ পৃষ্ঠা, সুনান আবূ দাউদ ৪/৪৮০৭, সুনান বায়হাকী ১০/১৯৩, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ২/৬৭৯, হাদীস ৩৮, মাজমা‘উয যাওয়ায়িদ ৮/১৮ পৃষ্ঠা। হাদীস সহীহ)

আর ইবনুল মুবারক বলেন, الرحمن হলো, যার কাছে চাওয়া হলে তিনি দান করেন। আর الرحيم হলো যার কাছে প্রার্থনা না করলে তিনি ক্রোধান্বিত হোন। আর এর স্বপক্ষে জামি‘ তিরমিযী ও ইবনু মাজাতে বর্ণিত হাদীস প্রমাণ যোগ্য, যা আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ অর্থাৎ যে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না, মহান আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হোন। (জামি‘ তিরমিযী, হাদীস- ৫/৩৩৭৩, ইবনু মাজাহ ২/৩৮২৮, হাদীস সহীহ) কোন একজন কবি বলেছেনঃ

لا تطلبن بني آدم حاجة ... وسل الذي أبوابه لا تغلق

الله يغضب إن تركت سؤاله ... وبني آدم حين يسأل يغضب

তুমি আদম সন্তানের কাছে প্রয়োজন পূরণের কামনা করো না, বরং তাঁর কাছে চাও, যার দরজা কখনো বন্ধ করা হয় না। মহান আল্লাহ ক্রোধান্বিত হোন যদি তুমি তাঁর কাছে চাওয়া বর্জন করো, আর আদম সন্তান রাগান্বিত হয় তার কাছে চাওয়া হয়।

ইবনু জারীর (রাঃ) আযরামী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, রাহমানের অর্থ হলো যিনি সমুদয় সৃষ্ট জীবের প্রতি করুণা বর্ষণকারী। আর রাহীমের অর্থ হলো যিনি মু’মিনদের ওপর দয়া বর্ষণকারী। (তাফসীর তাবারী ১/ ১০৩ হাদীস ১৪৬, হাদীস য‘ঈফ) যেমন কুর’আনুল হাকীমের নিম্নের দু’টি আয়াতে রয়েছেঃ

তারপর তিনি ‘আরশে সমাসীন হোন। (২৫ নং সূরাহ্ ফুরকান, আয়াত নং ৫৯) মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ ﴿اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى﴾ ﴿ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۛ اَلرَّحْمٰنُ ﴾

দয়াময় ‘আরশে সমাসীন। (২০ নং সূরাহ্ তা-হা, আয়াত নং ৫)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর আর-রাহমান’ নামসহ ‘আরশে অবস্থান করতেন এবং তার সকল সৃষ্টিকে তাঁর দয়া ও রহমত ঘিরে রেখেছে। তিনি অন্যত্র আরো বলেনঃ ﴿وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا﴾ আর তিনি মু’মিনদের প্রতি পরম দয়ালু। (৩৩ নং সূরাহ্ আহযাব, আয়াত নং ৪৩)

সুতরাং জানা গেলো যে, رَحْمَن-এর মধ্যে رَحِيْم-এর তুলনায় مُبَالَغَة অনেক গুণ বেশি আছে। (তাফসীর কুরতুবী ১/১০৫) কিন্তু হাদীসের একটি দু‘আর মধ্যে رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا এভাবেও এসেছে। ‘রাহমান’ নামটি আল্লাহ তা‘আলার জন্যই নির্ধারিত। তিনি ছাড়া আর কারো এ নাম হতে পারে না। যেমন আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ রয়েছেঃ

﴿قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۭ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاۗءُ الْحُسْنٰى﴾

বলো! তোমরা ‘আল্লাহ’ নামে আহ্বান করো অথবা ‘রাহমান’ নামে আহ্বান করো, তোমরা যে নামেই আহ্বান করো না কেন, সব সুন্দর নামই তো তাঁর! (১৭ নং সূরাহ্ ইসরাহ, আয়াত নং ১১০)

অন্য একটি আয়াতে আছেঃ ﴿وَاسْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ﴾

‘তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস করো, আমি কি দয়াময় মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন দেবতা স্থির করেছিলাম, যার ‘ইবাদত করা যায়? (৪৩ নং সূরাহ্ যুখরুফ, আয়াত নং ৪৫)

মুসাইলামাতুল কায্যাব যখন নাবুওয়াতের দাবী করে এবং নিজেকে ‘রাহমানুল ইয়ামামা’ নামে দাবী করে, আল্লাহ তা‘আলা তখন তাকে অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত করেন এবং চরম মিথ্যাবাদী নামে সে সারা দেশে সবার কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে। আজও তাকে মুসাইলামা কায্যাব বলা হয় এবং প্রত্যেক মিথ্যা দাবীদারকে তার সাথে তুলনা করা হয়। আজ প্রত্যেক পল্লীবাসী ও শহরবাসী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত আবালবৃদ্ধ সবাই তাকে মিথ্যাবাদী বলে জানে।

কোন কোন বিদ্বান মনে করেন যে, الرحمن এর চেয়ে الرحيم এর মধ্যেই অর্থের আধিক্যতা বেশি রয়েছে। কেননা এ শব্দের সাথে পূর্বের শব্দের তাকিদ করা হয়েছে। আর যার তাকিদ করা হয়, তা অপেক্ষা তাকিদই বেশি জোরদার হয়ে থাকে। এর উত্তর এই যে, এটাতো তাকিদই হয় না, বরং এটা একটি نَعْتٌ তথা গুণবাচক বিশেষ্য। সুতরাং উপরোক্ত কোন বিষয়ই এর মধ্যে আবশ্যক করবে না। আর এরই ভিত্তিতে বলা হবে যে, 'আল্লাহ' নামটি অগ্রগামী করা হয়েছে যার পূর্বে এমন নাম তিনি ছাড়া আর কেউ রাখেনি। আর 'রাহমান' সিফত প্রথমে এনে উক্ত নাম অন্য কারো রাখাকে নিষেধ করছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

﴿قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى﴾

'বলো! তোমরা 'মহান আল্লাহ' নামে আহ্বান করো অথবা 'রাহমান' নামে আহ্বান করো, তোমরা যে নামেই আহ্বান করো না কেন, সব সুন্দর নামই তো তাঁর!' (১৭ নং সূরাহ্ ইসরাহ, আয়াত নং ১১০)

মুসাইলামাতুল কায্যাব এ জঘন্যতম স্পর্ধা দেখালেও সে সমূলে ধ্বংস হয়েছিলো এবং তার ভ্রষ্ট সাথীদের ছাড়া এটা অন্যের ওপর চালু হয়নি। 'রাহীম' বিশেষণটির সাথে আল্লাহ তা'আলা অন্যদেরকেও বিশেষিত করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

'তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট একজন রাসূল এসেছেন, তোমাদের যা কিছু কষ্ট দেয় তা তার নিকট খুবই কষ্টদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী, মু'মিনদের প্রতি করুণাসিক্ত, বড়ই দয়ালু।' (৯ নং সূরাহ্ তাওবাহ, আয়াত নং ১২৮)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে رحيمٌ বলেছেন। এভাবেই তিনি স্বীয় কতোগুলো নাম দ্বারা অন্যদেরকে স্মরণ করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ

﴿اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا﴾

আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্র'বিন্দু থেকে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এ জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। (৭৬ নং সূরাহ্ আদ্ দাহর, আয়াত নং ২)

এখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে سَمِيْعٌ ও بَصِيْرٌ বলেছেন। মোট কথা এই যে, মহান আল্লাহর কতোগুলো নাম এমন রয়েছে যেগুলোর প্রয়োগ ও ব্যবহার অন্য অর্থে অন্যের ওপরও হতে পারে এবং কতোগুলো নাম আবার মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ওপর ব্যবহৃত হতেই পারে না। যেমন আল্লাহ, রাহমান, খালিক, রাযিক ইত্যাদি। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা প্রথম নাম নিয়েছেন 'আল্লাহ', তারপর এর বিশেষণ রূপে 'রাহমান' এনেছেন। কেননা, 'রাহীমের' তুলনায় এর বিশেষত্ব ও প্রসিদ্ধি অনেক গুণ বেশি। মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম তাঁর সবচেয়ে বিশিষ্ট নাম নিয়েছেন, কেননা নিয়ম রয়েছে সর্বপ্রথম সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন নাম নেয়া। তারপর তিনি তুলনামূলকভাবে স্বল্প মানের ও নিম্ন মানের এবং তারও পরে তদপেক্ষা কম টা নিয়েছেন।

একটি জিজ্ঞাসা ও তার জবাব

যদি বলা হয়, যেহেতু الرحمن শব্দটি অর্থের অনেক আধিক্যতা রাখে, সুতরাং الرحيم না বলে শুধু রাহমানের ওপর যথেষ্ট বা ক্ষ্যান্ত করা হলো না কেন? তাহলে এর জবাব হলো 'আতা খুরাসানি কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি। যার ভাবার্থ হলো যেহেতু মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামও রাহমান রাখা হয়, তাই الرحيم নিয়ে আসা হয়েছে যাতে সংশয় কেটে যায়। কেননা الرحمن ও الرحيم শব্দ দু'টি আল্লাহ তা'আলারই গুণ হিসেবে নিয়ে আসা হয়। (তাফসীরে ইবনু জারীর)

কেউ কেউ বলেন যেঃ ﴿قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ١ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى﴾

'বলো! তোমরা 'মহান আল্লাহ' নামে আহ্বান করো অথবা 'রাহমান' নামে আহ্বান করো, তোমরা যে নামেই আহ্বান করো না কেন, সব সুন্দর নামই তো তাঁর!' (১৭ নং সূরাহ্ ইসরাহ, আয়াত নং ১১০) অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কুরাইশ কাফিররা রাহমানের সাথে পরিচিতিই ছিলো না। যার ফলেই হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আলী (রাঃ)-কে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ লিখতে বললে কুরাইশ কাফিররা বলেছিলো, আমরা الرحمن ও الرحيم এর সাথে পরিচিত নই। (সহীহুল বুখারী, হাদীস - ৫/২৭৩১, মুসনাদ আহমাদ, হাদীস- ১/৮৬) কোন কোন বর্ণনায় আছে, তারা বলেছিলো আমরা ইয়ামামার রাহমান ব্যতীত অন্য কোন রাহমানকে চিনি না। আর মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَ مَا الرَّحْمٰنُ١ۗ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَ زَادَهُمْ نُفُوْرًا﴾

তাদের যখন বলা হয় 'রাহমান'-এর উদ্দেশে সাজদায় অবনত হও, তারা বলেন 'রাহমান আবার কী? আমাদের তুমি যাকেই সাজদাহ করতে বলবে আমরা তাকেই সাজদাহ করবো নাকি?' এতে তাদের অবাধ্যতাই বেড়ে যায়। (২৫ নং সূরাহ আল ফুরক্বান, আয়াত-৬০)

বাহ্যিক ভাবার্থ এই যে, তাদের কুফরীতে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনের কারণেই তারা এই অস্বীকার করেছিলো। কেননা জাহিলী যুগের কবিতাগুলোর মধ্যে মহান আল্লাহর 'রাহমান' নামটি দেখতে পাওয়া যায়। যেমন অজ্ঞতা যুগের ঐ সব জাহিলী কবিদেরই একজন কবির কবিতা হলোঃ ألا ضَرَبَتْ تلك الفتاةُ هَجِينَها ... ألا قَضَبَ الرحمنُ رَبى يمينها

সালামাহ ইবনু জনদাল বলেনঃ عَجِلتم علينا عَجْلَتينَا عليكُمُ ... وما يَشَأ الرّحْمَن يَعْقِد ويُطْلِقِ

ইবনু জারীর (রহঃ) আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, الرحمن ও الرحيم শব্দ দু'টি رحمة থেকে নির্গত। আর এটা 'আরবদের ভাষা। তিনি বলেন الرحمن الرحيم অর্থাৎ নম্র ও দয়ালু তার প্রতি যিনি অনুগ্রহ করাকে পছন্দ করেন। আর তার থেকে অনেক দূরে, যে তার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করাকে পছন্দ করে। এ রকমই তার প্রতিটি নাম। (তাফসীরে ইবনু জারীর, হাদীসটি য'ঈফ)

ইবনু জারীর (রহঃ) হাসান (রহঃ)-এর সূত্রে বলেন, 'রাহমান' নামটি মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য নিষিদ্ধ। (তাফসীরে ইবনু জারীর, হাদীসটি হাসান)

ইবনু আবী হাতিম (রহঃ) হাসান (রহঃ)-এর সূত্রে বলেন, 'রাহমান' নামের ওপর মানুষের কোন অধিকার নেই। এটা আল্লাহ তা'আলারই নাম। (তাফসীরে হাসান বাসরী, হাদীসটি য'ঈফ)

উম্মু সালামাহ (রাঃ)-এর হাদীসটি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক আয়াতে থামতেন এবং এভাবেই কুফীদের একটা দল বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমের ওপর ওয়াক্ফ করে তাকে আলাদাভাবে তিলাওয়াত করে থাকেন। আবার তাদের কেউ কেউ মিলিয়েও পড়েন। এমতাবস্থায় দু'টি সাকিন একত্রিত হওয়ায় মীম অক্ষরে যের দিয়ে পড়েন। আর এটাই জামহূর 'আলিমগণের অভিমত। কুফীদের মধ্য থেকে নাহবিদ কুসাই আরবদের কোন এক নজরে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তারা মীমে যবর দিয়ে পড়েন। এ ক্ষেত্রে তারা হামযার যবরটি মীমকে দিয়ে থাকেন, মীমের হারকাতটি দূর করে সাকিন করার পর। যেমন পড়া হয় মহান আল্লাহর নিম্নেরছছঙণ বাণীটিঃ ﴿الٓمٓ . اللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ﴾

ইবনু 'আতিয়্যাহ (রহঃ) বলেন, আমার জানামতে এ ক্বিরা'আতটি কোন লোক থেকে বর্ণিত হয়নি।

دال ও لام এর হরকত প্রসঙ্গ

সাতজন ক্বারীই (তারা হলেন ইবনু আমির, ইবনু কাসীর, ‘আসিম, আবূ ‘আমর, হামযাহ, নাফি‘, আল কাসায়ী) الحمد এর دال বর্ণে পেশ দিয়ে পড়ে থাকেন। আর এমতাবস্থায় তা তথা الحمد لله কে مبتداء وخبر বা উদ্দেশ্য ও বিধেয় বলে থাকেন।

আর সুফইয়ান ইবনু ‘উয়াইনাহ এবং রু’বাহ ইবনু আজ্জাজের মতে دال বর্ণে যবর হবে। তাদের মতে এখানে ক্রিয়া পদটি উহ্য আছে।

ইবনু আবি ‘আবলাহ الحمدُ এর دال এবং لله এর প্রথম لام বর্ণে পেশ দিয়ে ‘লাম’ কে প্রথমটির অনুগামী করে পড়তেন। এর স্বপক্ষে অনেক শাহিদ বা প্রমাণ থাকলেও এটা শায বা বিরল।

আর হাসান বাসরী ও যায়দ ইবনু ‘আলী (রাঃ) উক্ত দু’ অক্ষরের মধ্যে دال কে لام এর অনুগামী ধরে যের দিয়ে পড়ে থাকেন।

‘হামদ’ শব্দের অর্থ

ইমাম ইবনু জারীর (রহঃ) বলেন যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ-এর অর্থ এই যে, কৃতজ্ঞতা শুধু মহান আল্লাহর জন্য, তিনি ছাড়া আর কেউ এর যোগ্য নয়, তা সে সৃষ্ট জীবের মধ্যে যে কেউ হোক না কেন। কেননা সমুদয় দান যা আমরা গণনা করতে পারি না এবং তার মালিক ছাড়া কারো সেই সংখ্যা জানা নেই, সবই তাঁর কাছ থেকেই আগত। তিনিই তাঁর আনুগত্যের সমুদয় মালমসলা আমাদের দান করেছেন। আমরা যেন তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলতে পারি সেজন্য তিনি আমাদেরকে শারীরিক সমুদয় নি‘য়ামত দান করেছেন। তারপর ইহলৌকিক অসংখ্য নি‘য়ামত এবং জীবনের সমস্ত প্রয়োজন আমাদের অধিকার ছাড়াই তিনি আমাদের নিকট না চাইতেই পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর সদা বিরাজমান অনুকম্পা এবং তাঁর প্রস্তুতকৃত পবিত্র সুখের স্থান, সেই অবিনশ্বর জান্নাত আমরা কিভাবে লাভ করতে পারি তাও তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন। সুতরাং আমরা এখন নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, এসবের যিনি মালিক, প্রথম ও শেষ সমুদয় কৃতজ্ঞতা একমাত্র তাঁরই ন্যায্য প্রাপ্য। (তাফসীর তাবারী ১/১৩৫)

‘হাম্দ’ ও ‘শোক্র’ এর মধ্যে পার্থক্য

ইবনু জারীর (রহঃ) বলেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ একটি প্রশংসামূলক বাক্য। মহান আল্লাহ নিজের প্রশংসা নিজেই করেছেন এবং ঐ প্রসঙ্গেই তিনি যেন বলে দিলেনঃ তোমরা বলো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ অর্থাৎ ‘সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য।’

তিনি বলেন, কেউ কেউ এ কথাও বলেন যে, 'আলহামদু লিল্লাহ' বলে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নাম ও বড় বড় গুণাবলীর দ্বারা তাঁর প্রশংসা করা হয়। (তাফসীর তাবারী ১/১৩৭) আর اَلشُّكْرُ للهِ বলে তাঁর দান ও অনুগ্রহের ফলে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। তবে এ কথাটি সঠিক নয়। কেননা 'আরবী ভাষায় যাঁরা পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন তাঁরা এ বিষয়ে এক মত যে, شُكر-এর স্থলে حَمْد ও حَمْد-এর স্থলে شُكر ব্যবহৃত হয়ে থাকে। জা'ফর সাদিক ও ইবনু 'আতা (রহঃ) প্রমুখ সূফীগণ এমনটি বলেছেন। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রত্যেক কৃতজ্ঞের কৃতজ্ঞতা প্রকাশক কথা হলো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ। কুরতুবী ইবনু জারীরের সমর্থনে দালীল এনে বলেন যে, কেউ যদি اَلْحَمْدُ للهِ شُكْرًا বলে তবে এটাও নির্ভুল হবে। ইবনু জারীর যে মত পোষণ করেন তা গবেষণার বিষয়। কেননা পরবর্তি অনেক 'উলামাগণ কর্তৃক প্রসিদ্ধতা লাভ করেছে যে, প্রশংসিত ব্যক্তির প্রত্যক্ষ গুণাবলীর জন্য বা পরোক্ষ গুণাবলীর জন্য মুখে তাঁর প্রশংসা করার নাম 'হামদ'। আর শুধুমাত্র পরোক্ষ গুণাবলীর জন্য তাঁর প্রশংসা করার নাম শুকর। আর তা অন্তর, ভাষা, কাজের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন কবির উক্তিঃ أَفَادَتْكُمُ النَّعْمَاءُ مِنِّيْ ثَلَاثَةٌ ... يَدِيْ وَلِسَانِيْ وَالضَّمِيْرُ الْمُحَجَّبَا

তবে তাঁরা حمد এবং شكر এর মধ্যে কোনটি আম এ বিষয়ে দু'টি উক্তি করেছেন। বাস্তবতা হলো এ শব্দ দু'টির মাঝে 'আম ও খাস এর সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় গুণের সাথেই সমভাবে সম্পর্কিত ও সংযুক্ত থাকার কারণে এক দিক থেকে حمد শব্দটি شكر শব্দ হতে 'আম। আবার শুধু জিহবা দিয়ে তা উচ্চারণ করা হয় বিধায় তা خاص এবং شكر শব্দটিই হচ্ছে 'আম। কেননা তা কথা, কাজ ও নিয়তের মাধ্যমে সংঘটিত হয় যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। আবার পরোক্ষ গুণের ওপর বলা হয় বলে شكر শব্দটি خاص। যেমন পবিত্রতার ওপর شكرته বলা হয় না কিন্তু شكرته على كرمه وإحسانه إليّ বলা যায়। সঠিকটি মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

আবূ নাসর ইসমা'ঈল ইবনু হাম্মাদ আল জাওহারী (রহঃ) বলেন যে حمد অর্থাৎ প্রশংসা শব্দটি ذم তথা নিন্দা বা তিরস্কারের উল্টো। যেমন বলা হয়,

ومحمدة فهو حميد ومحمود حَمِدت الرجل أحمده حمدًا

التحميد শব্দটি حمد এর চেয়ে অর্থের আধিক্যতা রাখে। আর حمد শব্দটি شكر শব্দের চেয়ে 'আম। তিনি বলেন দাতার দানের ওপর তার প্রশংসা করাকে 'আরবী ভাষায় شكر বলা হয়। شكرته এবং شكرت له দু'ভাবেই বলা যায়। তবে লাম যোগে বলাই উত্তম। আর مدح শব্দটি حمد হতেও বেশি 'আম। কেননা জীবিত ও মৃত এমনকি জড় পদার্থের ক্ষেত্রেও مدح শব্দটি প্রয়োগ হয়ে থাকে। অনুগ্রহের পূর্বে ও পরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গুণাবলীর ওপর তার ব্যাপক ব্যবহার হয়ে থাকে বলেই এটা আম হওয়া সাব্যস্ত। সঠিকটি মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

'হাম্দ' শব্দের তাফসীর ও সালাফগণের অভিমত

‘উমার (রাঃ) একবার বলেছিলেনঃ سُبْحَانَ اللهِ ও لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ এবং কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, اَللهُ أَكْبَرْ-কে আমরা জানি, কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ-এর ভাবার্থ কি? ‘আলী (রাঃ) উত্তরে বললেনঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা এ কথাটিকে নিজের জন্য পছন্দ করেছেন। (তাফসীর তাবারী ১/১৫। অত্র হাদীসের সনদে হাজ্জাজ ইবনু আরতাত সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী বলেন যে, তিনি সত্যবাদী, তবে খুব বেশি ভুল করতেন এবং তাদলীস করে বর্ণনা করতেন। উসতায কে বাদ দিয়ে উসতাযের উসতায বা উর্দ্ধতন কারো থেকে বর্ণনা করাকে তাদলীস বলে) কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, এটা বললে মহান আল্লাহকে খুবই ভালো লাগে।’ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ ‘এটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশক বাক্য। এর উত্তরে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। (তাফসীর তাবারী ১/১৩) সুতরাং এ কথাটির মধ্যে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা ছাড়াও তার দানসমূহ, হিদায়াত, অনুগ্রহসহ প্রভৃতির স্বীকারোক্তি রয়েছে। কা‘ব আহবার (রাঃ)-এর মত হলো এ কথাটি মহান আল্লাহর প্রশংসামূলক।

যাহহাক (রহঃ) বলেন, মহান আল্লাহর চাদর। হাদীসেও এটা আছে। ইবনু জারীর (রহঃ) হাকাম ইবনু ‘উমায়ির (রাঃ)-এর সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বললেই মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়ে যাবে। এবং তিনি আরো বাড়িয়ে দিবেন। (তাফসীর তাবারী, হাদীসটি য‘ঈফ) তাফসীরে তাবারী, হাদীসটি য‘ঈফ।

‘আল-হাম্দ’ শব্দের গুরুত্ব ও ফাযীলত

আসওয়াদ ইবনু সারী’ (রাঃ) একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে আরয করেনঃ ‘আমি মহান আল্লাহর প্রশংসামূলক কয়েকটি কবিতা রচনা করেছি। অনুমতি পেলে শুনিয়ে দিবো।’ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ أَمَا إِنَّ رَبَّكَ يُحِبُّ الْحَمْدَ

‘তোমার প্রতিপালক তথা মহান আল্লাহ নিজের প্রশংসা শুনতে পছন্দ করেন।’ (মুসনাদ আহমাদ ৩/৪৩৫, সুনান নাসাঈ ৪/৪১৬) মুসনাদ আহমাদ, সুনান নাসাঈ, জামি‘উত তিরমিযী এবং সুনান ইবনু মাজাহয় ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله.

‘সর্বোত্তম যিক্‌র হচ্ছে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ এবং সর্বোত্তম প্রার্থনা হচ্ছে ‘আলহামদুলিল্লাহ।’ (হাদীসটি হাসান। জামি‘তিরমিযী ৯/৩২৪, সুনান নাসাঈ ৬/২০৮, ইবনু মাজাহ ২/১২৪৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এ হাদীটিকে পরিভাষা অনুযায়ী ‘হাসান গারীব’ বলেছেন। সুনান ইবনু মাজায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

"ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ"

‘মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাকে কিছু দান করার পর যদি সে তাঁর জন্য ‘আলহামদুলিল্লাহ’ পাঠ করে তাহলে তাঁর প্রদত্ত বস্তুই গৃহীত বস্তু হতে উত্তম হবে।’ (ইবনু মাজাহ ২/১২৫০, জামি‘তিরমিযী ৫/৩৩৮৫)

নাওয়াদিরুল উসূল নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন যেঃ لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال: الحمد لله، لكان الحمد لله أفضل من ذلك

আমার উম্মাতের কোন ব্যক্তির হাতে দুনিয়া ভর্তি কিছু দেয়া হয় অতঃপর সে তাতে শুকরিয়া স্বরূপ ‘আল হামদু লিল্লাহ’ বলে, তাহলে তাকে প্রদত্ত বস্তু অপেক্ষা ‘আল হামদু লিল্লাহ’ উত্তম হবে। (হাদীসটি মাওযু)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় কুরতবী (রহঃ) ও অন্যান্যরা বলেনঃ এর ভাবার্থ হলো, ‘আল হামদু লিল্লাহ’ বলার তাওফীক লাভ যতো বড় নি‘য়ামত, সারা দুনিয়া দান করাও ততো বড় নি‘য়ামত নয়। কেননা দুনিয়া তো নশ্বর ও ধ্বংসশীল, কিন্তু একথার পুণ্য অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী। যেমন পবিত্র কুর’আনের মধ্যে রয়েছেঃ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا.

‘ধন-সম্পদ আর সন্তানাদি পার্থিব জীবনের শোভা-সৌন্দর্য। আর তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার লাভের জন্য স্থায়ী সৎকাজ হলো উৎকৃষ্ট। আর আকাঙ্ক্ষা পোষণের ভিত্তি হিসেবেও উত্তম।” (১৮ নং সূরাহ আল কাহাফ, আয়াত -৪৬)

সুনান ইবনু মাজায় ইবনু ‘উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ একবার এক ব্যক্তি এই দু‘আ পাঠ করলোঃ

يَارَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ.

‘হে আমার রাব্ব! তোমার বিশাল ক্ষমতা এবং মহান সত্বার মর্যাদানুসারে তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা।’ এতে ফিরিশতা সাওয়াব লিখার ব্যাপারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। অবশেষে তাঁরা মহান আল্লাহর নিকট আরয করলেনঃ আপনার এক বান্দা এমন একটি কালিমা পাঠ করেছে যার সাওয়াব আমরা কি লিখবো বুঝতে পারছিনা।’ বিশ্বপ্রভু সব কিছু জানা সত্বেও জিজ্ঞেস করলেনঃ ‘সে কি কথা বলেছে? তাঁরা বললেন যে, সে এই কালিমা বলেছে। তখন আল্লাহ তা‘আলা বললেনঃ

اُكْتُبُوْهَا كَمَا قَالَ عَبْدِيْ حَتَّى يَلْقَانِيْ فَأُجْزِيْهِ بِهَا

‘সে যা বলেছে তোমরা হুবহু তাই লিখে নাও। আমি তার সাথে সাক্ষাতের সময়ে নিজেই তার যোগ্য প্রতিদান দিবো।’ (সুনান ইবনু মাজাহ ২/৩৮০১, হাদীস য‘ঈফ) কুরতুবী (রহঃ) ‘আলিমদের একটি দল হতে বর্ণনা করেছেন যে, ‘লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ হতেও ‘আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল ‘আলামীন’ উত্তম। কেননা এর মধ্যে

ওয়াহদানিয়ত বা একত্ববাদ ও প্রশংসা দু'টোই বিদ্যমান। কিন্তু অন্যান্য বিদ্যানগণের ধারণা হলো 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উত্তম। কেননা ইমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্যের সীমা রেখা এটাই। আর এটা বলার জন্যই কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা হয়। যেমনটি সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। (সহীহুল বুখারী ১/২৫, সহীহ মুসলিম ১/৮, ৩৩, ৩৬, ৫২, ৫৩, হাঃ ২২; আ.প্র. হাঃ ২৪, ই.ফা. হাঃ ২৪) অন্য একটি বর্ণনায় আছে মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِيْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ

আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ যা উচ্চারণ করেছি তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু ...। (জামি' তিরমিযী ৫/৩৫৮৫, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ১/৩২, ২১৪, ২১৫, সুনান বায়হাকী ৫/১১৭, হাদীস হাসান)

জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত মারফূ' হাদীস যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তাতে আছে যে, أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله.

'সর্বোত্তম যিক্‌র হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এবং সর্বোত্তম প্রার্থনা হচ্ছে 'আলহামদুলিল্লাহ।' (ইবনু মাজাহ ২/১২৫০, জামি'তিরমিযী ৫/৩৩৮৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

'হাম্দ' শব্দের পূর্বে 'আল' শব্দ প্রয়োগের গুরুত্ব ও ফাযীলত

'আল হামদু'-এর আলিফ লাম 'ইসতিগরাকের' জন্য ব্যবহৃত। অর্থাৎ সমস্ত প্রকারের 'হাম্দ' বা স্তুতিবাদ একমাত্র মহান আল্লাহরই জন্য সাব্যস্ত। যেমন হাদীসে রয়েছেঃ

اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ.

'হে মহান আল্লাহ! সমুদয় প্রশংসা তোমারই জন্য, সারা দেশ তোমারই, তোমারই হাতে সামগ্রিক মঙ্গল নিহিত রয়েছে এবং সমস্ত কিছু তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করে থাকে।' (আত তারগীব ওয়াত তারহীব ২/৪৪১, হাদীস য'ঈফ)

'রাব্ব' শব্দের অর্থ

সর্বময় কর্তাকে ‘রাব্ব’ বলা হয় এবং এর আভির্ধানিক অর্থ হচ্ছে নেতা এবং সঠিকভাবে সজ্জিত ও সংশোধনকারী। এসব অর্থ হিসাবে আল্লাহ তা‘আলার জন্য এ পবিত্র নামটিই শোভনীয় হয়েছে। ‘রাব্ব’ শব্দটি মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য ব্যবহৃত হতে পারে না। তবে সম্বন্ধ পদ রূপে ব্যবহৃত হলে সে অন্য কথা। যেমন رَبُّ الدَّارِ বা গৃহস্বামী ইত্যাদি। বলা হয়েছে যে, রাব্ব হলো মহান আল্লাহর মহান নামসমূহের অন্যতম নাম।

‘আলামীন’ শব্দের অর্থ

عَالَمِيْنَ শব্দটি عَالَمٌ শব্দের বহু বচন। মহান আল্লাহ ছাড়া সমুদয় সৃষ্টবস্তুকে عَالَم বলা হয়। عَالَم শব্দটিও বহুবচন এবং এ শব্দের এক বচনই হয় না। আকাশের সৃষ্টজীব এবং পানি ও স্থলের সৃষ্টজীবকেও عَوَالِم অর্থাৎ কয়েকটি عَالَم বলা হয়। অনুরূপভাবে এক একটি যুগ-কাল ও এক একটি সময়কেও عَالَم বলা হয়। বিশর ইবনু ‘আম্মারাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি তথা ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) عَالَمٌ এর তাফসীরে বলেছেন, এর দ্বারা সকল সৃষ্টিজীবকেই বুঝায়, নভোমণ্ডলের হোক বা ভূমণ্ডলের হোক, অথবা এ দুয়ের মাঝের কিছু হোক, আর তা আমাদের জানা হোক বা না জানা হোক। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে এর ভাবার্থও বর্ণিত হয়েছে যে, ربُّ الإنس والجن অর্থাৎ তিনি মানব দানব সকলেরই প্রতিপালক। সা‘ঈদ ইবনু যুবায়র (রহঃ) ও ‘আলী ইবনু আবি তালিব (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনু আবী হাতিম বলেন হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য নয়। উক্ত কথার প্রমাণ স্বরূপ ইমাম কুরতুবী (রহঃ) নিম্নের আয়াতটি পেশ করেছেনঃ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ‘যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।’ (২৫ নং সূরাহ আল ফুরক্বান, আয়াত-১)

ফার্রা (রহঃ) ও আবূ ‘উবাইদাহ (রহঃ)-এর মতে প্রতিটি বিবেকসম্পন্ন প্রাণীকে ‘আলাম’ বলা হয়। যায়দ ইবনু আসলাম (রহঃ) এবং আবূ মুহাইসীন (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক প্রাণীকেই ‘আলাম’ বলা হয়। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক শ্রেণীকে একটা ‘আলাম বলা হয়।

ইবনু ‘আসাকির (রহঃ) বানূ উমাইয়্যার সর্বশেষ খলিফা মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান ইবনুল হাকাম যার উপাধি ছিলো হিমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: মহান আল্লাহ সতেরো হাজার ‘আলাম সৃষ্টি করেছেন। আকাশের অধিবাসী ও যমীনের অধিবাসী প্রত্যেকটি আলাম। বাকীগুলো মহান আল্লাহই ভালো জানেন। মানুষের নিকট ওগুলো অজ্ঞাত।

আবূ জা‘ফর আর রাযী (রহঃ) আবুল ‘আলিয়া (রহঃ) হতে رب العالمين এর ব্যাখ্যা বর্ণনা করে বলেন, সমস্ত মানুষ একটা ‘আলাম। আর সমস্ত জ্বিন একটা ‘আলাম। তবে এছাড়াও আরো ১৮ হাজার বা ১৪ হাজার আলাম আছে। কিছু ফিরিশতা যমীনে আছে, আর যমীনের ৪টি প্রান্ত আছে। প্রত্যেক প্রান্তে সাড়ে তিন হাজার ‘আলাম তথা জগত রয়েছে। তাদেরকে মহান আল্লাহ শুধুমাত্র তাঁর ‘ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। ইবনু জারীর ও ইবনু আবী হাতিম(রহঃ) ও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ বর্ণনাটি সম্পূর্ণ গারীব বা

অপরিচিত। তবে এ ধরনের কথা যে পর্যন্ত সহীহ দালীল ও অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত না হবে ততক্ষোণ পর্যন্ত তা মানবার উপযুক্ত নয়।

'রাব্বুল 'আলামীন' এর ব্যাখ্যায় ইবনু আবী হাতিম হুমাইরী (রহঃ) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, বিশ্ব জাহানে এক হাজার জাতি আছে। যার ছয়শ' জাতি পানিতে বাস করে এবং চার শত জাতি স্থলে বাস করে। সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) থেকেও অনরূপ বর্ণনা রয়েছে।

আবূ ইয়া'লা (রহঃ) জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, 'উমার (রাঃ)-এর শাসনামলের কোন এক বছর টিড্ডি বা ফড়িং দেখা যাচ্ছিলো না। ফলে তিনি এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু কোন সংবাদ তিনি সংগ্রহ করতে পারলেন না। ফলে খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং এক পর্যায়ে তিনি ইয়ামান, সিরিয়া ও 'ইরাকের দিকে অশ্বারোহী পাঠিয়ে দিলেন সে সব দেশে টিড্ডি বা ফড়িং দেখা যাচ্ছে কি না তা জানার জন্য। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর ইয়ামানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত অশ্বারোহী দল এক মুষ্টি টিড্ডি বা ফড়িং নিয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর সামনে সেগুলো ছেড়ে দিলেন। 'উমার (রাঃ) সেগুলো দেখতে পেয়ে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে উঠে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, 'মহান আল্লাহর এক হাজার জাতি আছে। যার ছয়শ' জাতি পানিতে বাস করে এবং চার শত জাতি স্থলে বাস করে। অতঃপর এই উম্মাতের সর্বোপ্রথম যে জাতি ধ্বংস হবে তা হলো টিড্ডি বা ফড়িং। আর যখন এ জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে তখন অন্যান্য জাতি তাসবীহের সূতা কেটে কাটি গুলো একের পর এক পরে যাওয়ার ন্যায় পরে যেতে থাকবে।' কিন্তু এ হাদীসের সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু 'ঈসা হিলালী নামক একজন দুর্বল রাবী' রয়েছে বিধায় হাদীসটি য'ঈফ।

ইমাম বাগাবী (রহঃ) ও সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহঃ) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি অর্থাৎ সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহঃ) বলেছেন, 'মহান আল্লাহর এক হাজার জাতি আছে। যার ছয় শত জাতি জলে বাস করে এবং চার শত জাতি স্থলে বাস করে।'

ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন, 'মহান আল্লাহর আঠারো হাজার 'আলাম তথা জগৎ আছে। পৃথিবীও একটি 'আলাম।

মুকাতিল (রহঃ) বলেন, মোট আশি হাজার 'আলাম আছে। আর কা'বুল আহবার বলেন যে, 'আলামের প্রকৃত সংখ্যা মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। এ সবই ইমাম বাগাবী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

জায্যায (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইহজগত ও পরজগতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সবই 'আলাম। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন যে, এ মতটিই সত্য। কেননা এর মধ্যে সমস্ত 'আলামই জড়িত রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِيْنَ. قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوْقِنِيْنَ.

ফির'আউন বললোঃ জগতসমূহের রাব্ব আবার কি? মূসা বললোঃ তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর রাব্ব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। (২৬ নং সূরাহ্ শু'আরা, আয়াত নং ২৩-২৪)

সৃষ্টবস্তুকে 'আলাম' বলার কারণ

عَلَم শব্দটি عَلَامَت শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে। কেননা 'আলাম' সৃষ্ট বস্তু তার সৃষ্টিকারীর অস্তিত্বের পরিচয় বহন করে এবং তাঁর একাত্মবাদের চিহ্নরূপে কাজ করে থাকে। (তাফসীর কুরতুবী ১/১৩৯) যেমন কবি ইবনু মু'তায এর কথাঃ

فيا عجبا كيف يعصى الإله ... أم كيف يجحده الجاحد

وفي كل شيء له آية ... تدل على أنه واحد

'এটা একটি বিস্ময়কর বিষয় যে, কিভাবে মানুষ মহান আল্লাহর অবাধ্য হতে পারে এবং কেমনে অস্বীকারকারী তাকে অস্বীকার করে। অথচ প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে এমন স্পষ্ট নিদর্শন আছে যে, তা প্রকাশ্যভাবে মহান আল্লাহর একত্ববাদের পরিচয় বহন করছে।'

[১] আরবী ভাষায় 'হাম্‌দ' অর্থ নির্মল ও সম্ভ্রমপূর্ণ প্রশংসা। গুণ ও সিফাত সাধারণতঃ দুই প্রকার হয়ে থাকে। তা ভালও হয় আবার মন্দও হয়। কিন্তু হাম্‌দ শব্দটি কেবলমাত্র ভাল গুণ প্রকাশ করে। অর্থাৎ বিশ্ব জাহানের যা কিছু এবং যতকিছু ভাল, সৌন্দর্যমাধুর্য, পূর্ণতা মাহাত্ম দান ও অনুগ্রহ রয়েছে তা যেখানেই এবং যে কোন রূপে ও যে কোন অবস্থায়ই থাকুক না কেন, তা সবই একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য নির্দিষ্ট, একমাত্র তিনিই-তাঁর মহান সত্তাই সে সব পাওয়ার অধিকারী। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্যই এর যোগ্য হতে পারে না। কেননা সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা তিনিই এবং তাঁর সব সৃষ্টিই অতীব সুন্দর। এর অধিক সুন্দর আর কিছুই হতে পারে না-মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। তাঁর সৃষ্টি, লালন-পালন-সংরক্ষণ-প্রবৃদ্ধি সাধনের সৌন্দর্য তুলনাহীন। তাই এর দরুন মানব মনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগে উঠা প্রশংসা ও ইচ্ছামূলক প্রশংসাকে 'হামদ বলা হয়। এখানে এটা বিশেষভাবে জানা আবশ্যক যে, 'আল-হামদু' কথাটি 'আশ-শুক্‌র' থেকে অনেক ব্যাপক, যা আধিক্য ও পরিপূর্ণতা বুঝায়। কেউ যদি কোন নিয়ামত পায়, তা হলে সেই নিয়ামতের জন্য শুকরিয়া প্রকাশ করা হয়। সে ব্যক্তি যদি কোন নিয়ামত না পায় (অথবা তার পরিবর্তে অন্য কোন লোক নিয়ামতটি পায়) স্বভাবতঃই তার বেলায় এজন্য শুকরিয়া নয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিয়ামত পায়, সে-ই

শুকরিয়া আদায় করে। যে ব্যক্তি নিয়ামত পায় না, সে শুকরিয়া আদায় করে না। এ হিসেবে 'আশ-শুক্‌র লিল্লাহ' বলার অর্থ হতো এই যে, আমি আল্লাহ্‌র যে নিয়ামত পেয়েছি, সেজন্য আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি। অপরদিকে 'আল-হামদুলিল্লাহ' অনেক ব্যাপক। এর সম্পর্ক শুধু নিয়ামত প্রাপ্তির সাথে নয়। আল্লাহ্‌র যত নেয়ামত আছে, তা পাওয়া যাক, বা না পাওয়া যাক; সে নিয়ামত কোন ব্যক্তি নিজে পেলো, বা অন্যরা পেলো, সবকিছুর জন্যই যে প্রশংসা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য সেটিই হচ্ছে 'হামদ'। এ প্রেক্ষিতে আল-হামদুলিল্লাহ' বলে বান্দা যেন ঘোষণা করে, হে আল্লাহ্‌! সব নিয়ামতের উৎস আপনি, আমি তা পাই বা না পাই, সকল সৃষ্টিজগতই তা পাচ্ছে; আর সেজন্য সকল প্রশংসা একান্তভাবে আপনার, আর কারও নয়। কেউ আপনার প্রশংসা করলে আপনি প্রশংসিত হবেন আর কেউ প্রশংসা না করলে প্রশংসিত হবেন না, ব্যাপারটি এমন নয়। আপনি স্বপ্রশংসিত। প্রশংসা আপনার স্থায়ী গুণ। প্রশংসা আপনি ভালবাসেন। আপনার প্রশংসা কোন দানের বিনিময়ে হতে হবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। [ইবন কাসীর] আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এখানে (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র' এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) 'আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি' এ শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। এর কারণ সম্ভবত এই যে, 'আহমাদুল্লাহ' বা 'আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি' এ বাক্যটি বর্তমানকালের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আমি বর্তমানকালে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি। অন্যদিকে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বা 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র' সর্বকালে (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে) প্রযোজ্য। আর এ জন্যই হাদীসে বলা হয়েছে,

(اَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ)

"সবচেয়ে উত্তম দো'আ হলো আল-হামদুলিল্লাহ" [তিরমিযী:৩৩৮৩]

কারণ, তা সর্বকাল ব্যাপী। অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

(وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ),

"আর 'আল-হামদুলিল্লাহ' মীযান পূর্ণ করে" [মুসলিম: ২২৩]

এ জন্য অধিকাংশ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিন-রাত্রির যিক্‌র ও সালাতের পরের যিক্‌র এর মধ্যে এ "আল হামদুলিল্লাহ" শব্দই শিখিয়েছেন। এ "আল-হামদুলিল্লাহ" পুর্ণমাত্রার প্রশংসা হওয়ার কারণেই আল্লাহ্‌ এতে খুশী হন। বিশেষ করে নেয়ামত পাওয়ার পর বান্দাকে কিভাবে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে হবে তাও "আল-হামদুলিল্লাহ" শব্দের মাধ্যমে করার জন্যই আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল শিখিয়ে দিয়েছেন। [দেখুন, ইবনে মাজাহ, ৩৮০৫]

এভাবে “আল-হামদুলিল্লাহ" হলো সীমাহীন প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার রূপ। আল্লাহ্‌র হামদ প্রকাশ করার ক্ষেত্র, মানুষের মন-মানষ, মুখ ও কর্মকাণ্ড। অর্থাৎ মানুষের যাবতীয় শক্তি দিয়ে আল্লাহ্‌র হামদ করতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্‌র ‘হামদ বা প্রশংসা’ শুধু মুখেই সীমাবদ্ধ রাখে। অনেকে মুখে আল-হামদুলিল্লাহ' বলে, কিন্তু তার অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রশংসা আসেনি আর তার কর্মকাণ্ডেও সেটার প্রকাশ ঘটে না।

[২] ‘সকল হামদ আল্লাহ্‌র’ এ কথাটুকু দ্বারা এক বিরাট গভীর সত্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। পৃথিবীর যেখানেই যে বস্তুতেই যাকিছু সৌন্দর্য ভাল প্রশংসার যোগ্য গুণ বা শ্রেষ্ঠত্ব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হবে, মনে করতে হবে যে, তা তার নিজস্ব সম্পদ ও স্বকীয় গৌরবের বস্তু নয়। কেননা সেই গুণ মূলতঃই তার নিজের সৃষ্টি নয়; তা সেই আল্লাহ্‌ তা'আলারই নিরঙ্কুশ দান, যিনি নিজের কুদরতে সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন। বস্তুতঃ তিনি হচ্ছেন সমস্ত সৌন্দর্য ও সমস্ত ভালোর মূল উৎস। মানুষ, ফেরেশতা, গ্রহ-নক্ষত্র, বিশ্ব-প্রকৃতি, চন্দ্র-সূর্য- যেখানেই যা কিছু সৌন্দর্য ও কল্যাণ রয়েছে, তা তাদের কারো নিজস্ব নয়, সবই আল্লাহ্‌র দান। অতএব এসব কারণে যা কিছু প্রশংসা হতে পারে তা সবই আল্লাহ্‌র প্রাপ্য। এসব সৃষ্টি করার ব্যাপারে যেহেতু আল্লাহ্‌র সাথে কেউ শরীক ছিলনা, কাজেই এসব কারণে যে প্রশংসা প্রাপ্য হতে পারে তাতেও আল্লাহ্‌র সাথে কারো এক বিন্দু অংশীদারিত্ব থাকতে পারে না। সুন্দর, অনুগ্রহকারী, সৃষ্টিকর্তা, লালন-পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা ও ক্রমবিকাশদাতা আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষ যা কিছু ভক্তি-শ্রদ্ধা ইবাদত-বন্দেগী এবং আনুগত্য পেশ করতে পারে; তা সবই একমাত্র আল্লাহ্‌র সামনেই নিবেদন করতে হবে। কেননা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন শক্তিই তার এক বিন্দুরও দাবীদার হতে পারে না। বরং তারই রয়েছে যাবতীয় হাম্‌দ। হাম্‌দ জাতীয় সবকিছু কেবল তাঁরই প্রাপ্য, কেবল তিনিই সেটার একমাত্র যোগ্য। তাছাড়া ভালো বা মন্দ সকল অবস্থায় কেবল এক সত্তারই ‘হামদ’ বা প্রশং করতে হয়। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্‌ তা'আলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন যে, কেউ যদি কোন খারাপ কিছুর সম্মুখীন হয়, তখনও যেন বলে,

(اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ)

বা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র জন্যই যাবতীয় হামদ [ইবন মাজাহঃ ৩৮০৩]

কুরআন হাদীস হতে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, সাধারণভাবে কোন ব্যক্তির গুণ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার এতখানি প্রশংসাও করা যায় না যাতে তার ব্যক্তিত্বকেই অসাধারণভাবে বড় করে তোলা হয় এবং সে আল্লাহ্‌র সমকক্ষতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। মূলতঃ এইরূপ প্রশংসাই মানুষকে তাদের পূজার কঠিন পাপে নিমজ্জিত করে। সে জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিকে বলেছেন: “যখন বেশী বেশী প্রশংসাকারীদেরকে দেখবে, তখন তাদের মুখের উপর ধূলি নিক্ষেপ কর। ” [মুসলিম: ৩০০২] নতুবা তার মনে গৌরব ও অহংকারী ভাবধারার উদ্রেক হতে পারে। হয়ত মনে করতে পারে যে, সে বহুবিধ গুণ-গরিমার অধিকারী, তার বিরাট যোগ্যতা ও ক্ষমতা আছে। আর কোন মানুষ যখন এই ধরনের খেয়াল নিজের মনে স্থান দেয় তখন তার পতন হতে শুরু হয় এবং সে পতন হতে উদ্ধার হওয়া কিছুতেই সম্ভব হয় না। তাছাড়া মানুষ যখন আল্লাহ্‌ ছাড়া অপর কারো গুণ সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে তার

প্রশংসা করতে শুরু করে, তখন মানুষ তার ভক্তি-শ্রদ্ধার জালে বন্দী হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত সে মানুষের দাসত্ব ও মানুষের পূজা করতে আরম্ভ করে। এই অবস্থা মানুষকে শেষ পর্যন্ত চরম পঙ্কিল শির্কের পথে পরিচালিত করতে পারে। সে জন্যই যাবতীয় 'হামদ' একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

[৩] 'আলামীন' বহুবচন শব্দ, একবচনে 'আলাম'। কোন কোন তাফসীরকার বলেন, 'আলাম' বলা হয় সেই জিনিসকে, যা অপর কোন জিনিস সম্পর্কে জানবার মাধ্যম হয়; যার দ্বারা অন্য কোন বৃহত্তর জিনিস জানতে পারা যায়। সৃষ্টিজগতের প্রত্যেকটি অংশ স্বতঃই এমন এক মহান সত্তার অস্তিত্বের নিদর্শন, যিনি তার সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পৃষ্ঠপোষক ও সুব্যবস্থাপক। এই জন্য সৃষ্টিজগতকে 'আলাম' এবং বহুবচনে আলামীন বলা হয়। [কাশশাফ] 'আলামীন' বলতে কি বুঝায়, যদিও এখানে তার ব্যাখ্যা করা হয় নি, কিন্তু অপর আয়াতে তা স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে। আয়াতটি হচ্ছে,

(قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ)

"ফিরআউন বললঃ রাব্বুল আলামীন কি? মূসা বললেনঃ যিনি আসমান-যমীন এবং এ দু'টির মধ্যবর্তী সমস্ত জিনিসের রব। " [সূরা আশ-শু'আরা: ২৩-২৪]

এতে 'আলামীন' এর তাফসীর হয়ে গেছে যে, সৃষ্টি জগতের আর সব কিছুই এর অধীন। আসমান ও যমীনে এত অসংখ্য 'আলাম' বিদ্যমান যে, মানুষ আজ পর্যন্ত সেগুলোর কোন সীমা নির্ধারণ করতে সমর্থ হয় নি। মানব-জগত, পশু-জগত, উদ্ভিদ-জগত-এই জগত সমূহের কোন সীমা-সংখ্যা নাই, বরং এগুলো অসীম অতলস্পর্শ জগত-সমুদ্রের কয়েকটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিন্দু মাত্র। মানব-বুদ্ধি সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে একেবারেই সমর্থ নয়। [কুরতুবী, ফাতহুল কাদীর]

[৪] 'রব্' শব্দের বাংলা অর্থ করা হয় প্রভু-লালন পালনকারী। কিন্তু কুরআনে প্রয়োগভেদে এ শব্দের অর্থঃ- সৃষ্টি করা, সমানভাবে সজ্জিত ও স্থাপিত করা, প্রত্যেকটি জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণ করা, পথ প্রদর্শন ও আইন বিধান দেওয়া, কোন জিনিসের মালিক হওয়া, লালন-পালন করা, রিযিক্ দান করা ও উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। তাছাড়া ভাঙ্গা গড়ার অধিকারী হওয়া, জীবনদান করা, মৃত্যু প্রদান করা, সন্তান দেয়া, আরোগ্য প্রদান করা ইত্যাদি যাবতীয় অর্থই এতে নিহিত আছে। আর যিনি এক সঙ্গে এই সব কিছু করার ক্ষমতা রাখেন তিনিই হচ্ছেন রব্। যেমন পবিত্র কুরআনের সূরা আল-আ'লায় এইরূপ ব্যাপক অর্থে রব্ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে,

(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۔ الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۔ وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى)

আপনার রব্ এর নামে তাসবিহ্ পাঠ করুন, যিনি মহান উচ্চ; যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাযথ ভাবে সজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করে দিয়েছেন; এবং যিনি সঠিক রূপে প্রত্যেকটি জিনিসের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। অতঃপর জীবন যাপন পন্থা প্রদর্শন করেছেন"। [সূরা আল-আ'লা: ১-৩]

এই আয়াত হতে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, 'রব্' তাঁকেই বলতে হবে যাঁর মধ্যে নিজস্ব ক্ষমতা বলে সৃষ্টি করার, সৃষ্টির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমান ও সজ্জিত করার, প্রত্যেকটির পরিমাণ নির্ধারণ করার এবং হেদায়েত, দ্বীন ও শরীআত প্রদান করার যোগ্যতা রয়েছে। যিনি নিজ সত্তার গুণে মানুষ ও সমগ্র বিশ্ব-ভূবনকে সৃষ্টি করেছেন; শুধু সৃষ্টিই নয়-যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা দান করেছেন ও তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পরস্পরের সহিত এমনভাবে সংযুক্ত করে সাজিয়ে দিয়েছেন যে, তার প্রত্যেকটি অঙ্গই পূর্ণ সামঞ্জস্য সহকারে নিজ নিজ স্থানে বসে গেছে। রব্ তিনিই—যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকেই কর্মক্ষমতা দিয়েছেন, সেই সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট কাজ ও দায়িত্বও দিয়েছেন। প্রত্যেকের জন্য নিজের একটি ক্ষেত্র এবং তার সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন,

(الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا)

"যিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন, এবং তার পরিমাণ ঠিক করেছেন " [সূরা আল-ফুরকান:২] অতএব এক ব্যক্তি যখন আল্লাহ্কে রব্ বলে স্বীকার করে, তখন সে প্রকারান্তরে এ কথারই ঘোষণা করে যে, আমার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দৈহিক, আধ্যাত্মিক, দ্বীনী ও বৈষয়িক-যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার দায়িত্ব ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই গ্রহণ করেছেন। আমার এই সবকিছু একমাত্র তাঁরই মর্জির উপর নির্ভরশীল। আমার সবকিছুর একচ্ছত্র মালিক তিনিই। আর কেউ তার কোন কিছু পূরণ করার অধিকারী নয়।

বস্তুতঃ সৃষ্টিলোকে আল্লাহ্র দু'ধরনের রবুবিয়্যাত কার্যকর দেখা যায়: সাধারণ রবুবিয়াত বা প্রকৃতিগত এবং বিশেষ রবুবিয়াত বা শরী'আতগত।

১) প্রকৃতিগত বা সৃষ্টিমূলক- মানুষের জন্ম, তাহার লালন পালন ও ক্রমবিকাশ দান, তার শরীরকে ক্ষুদ্র হতে বিরাটত্বের দিকে, অসম্পূর্ণতা হতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করা এবং তার মানসিক ক্রমবিকাশ ও উৎকর্ষতা দান।

২) শরীয়াত ভিত্তিক-মানুষের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রকে পথ প্রদর্শন করা, ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য নির্দেশের জন্য নবী ও রাসূল প্রেরণ। যারা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও প্রতিভার পূর্ণত্ব বিধান করেন। এদেরই মাধ্যমে তারা হালাল, হারাম ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হয়। নিষিদ্ধ কাজ হতে দূরে থাকতে এবং কল্যাণ ও মঙ্গলময় পথের সন্ধান লাভ করতে পারে।

অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার জন্য মানুষের রব্ হওয়ার ব্যাপারটি খুবই ব্যাপক। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের রব্ হওয়া কেবল এই জন্যই নয় যে, তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তার দেহের লালন পালন করেছেন এবং তাহার দৈহিক শৃঙ্খলাকে স্থাপন করেছেন। বরং এজন্যও তিনি রব্ যে, তিনি মানুষকে আল্লাহ্র বিধান মুতাবিক জীবন যাপনের সুযোগদানের জন্য নবী প্রেরণ করেছেন এবং নবীর মাধ্যমে সেই ইলাহী বিধান দান করেছেন।